ও অবক্ষয়ের এমনই এক চিত্র আঁকলেন কাব্যের অন্তভাগে যে তার পরে আর 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' বলাও কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু নাটকে? সে যে দৃশ্যকাব্য ; যেখানে নাটক দেখার শেষে প্রেক্ষকরা কোনও প্রশ্ন, কোনও গভীর সংশয় কোনও দ্বিধাব্যাকুলতা নিয়ে রঙ্গাস্থল ত্যাগ করলে তো চলবে না। মনে রাখতে হবে, নাটকের যে কটি প্রকারভেদ সমধিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেমন নাটক নাটিকা প্রকরণ, ব্যায়োগ ভাণ, ইত্যাদি—এগুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজারা বা ধনী বণিকরা। গণিকালয়ের মদনমন্দিরের চত্বরে, রাজসভায়, অথবা মন্দিরপ্রাঙ্গণেই নাট্যাভিনয় হত, সর্বত্রই রাজা বা ধনীই পৃষ্ঠপোষক ; এবং নাটক হল 'ঈশ্বরাণাং বিলাসস্তু'। তারা চিন্তার উপাদান বা জীবন সম্বন্ধে গভীর কোনও সংশয়ে জর্জরিত হওয়ার জন্যে অর্থব্যয় করত না, চাইত বিনোদন, পেতও তাই ; কারণ নাটক সেই খেলানা যা তাদের ভোলাত।

অন্যান্য দেশেও রাজা ও ধনীর আনুকূল্যেই নাটক মঞ্চস্থ হত, কিন্তু সেখানে নাটকের ক্রীড়নক হওয়ার বা বিনোদন করবার দায় ছিল না তাই নাটকের কাছে প্রেক্ষকের প্রত্যাশা ছিল জীবনবোধের সম্প্রসারণ, নৈতিক সংঘাতের সম্মুখীন হয়ে নায়ক কেমন করে শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষুদ্র স্বার্থকে অতিক্রম করতে পারলেন অশ্রুপাত ও মর্মের রক্তক্ষরণের মূল্যে, তা দেখে তাঁরা নিজেদের জীবনসংগ্রামে শক্তিসঞ্চয় করতে চাইতেন। তাই তাঁরা বলেছেন নাটককে হতে হবে গম্ভীর চরিত্র, নৈতিক সংঘাতে জয়লাভ করার দ্বারা এই গম্ভীরতার মর্যাদা অর্পণ করবে নাটককে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ; তাঁর পেলেন কালজয়ী গম্ভীর, গভীর জীবনালেখ্য ; আমরা পেলাম ক্রীড়নক।

আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকালেও ছিল। সেই আলেকজাণ্ডারের সময় থেকেই কিংবা তারও আগে থেকে। মধ্যযুগের একটা ছেদ পড়ে যায়, কারণ স্থলপথ হয় বিপৎসঙ্কুল। জলপথের সন্ধান একান্ত আবশ্যক হয়। এই কাজটি ভারতের দিক থেকে না হয়ে ইউরোপের দিক থেকে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইউরোপ ভারতকে বহু শতকের পর আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কারও করে। তার ধারণা ছিল ওটাই ভারতবর্ষ। এখানকার আদিবাসীরাই ভারতীয়।

এদিক থেকেও একটা পালটা আবিষ্কার বকেয়া ছিল। চার শতাব্দী পরে ভারতও

করে জলপথে আবার নতুন করে ইউরোপ আবিষ্কার। রামমোহন রায় করেন ইংলণ্ডে পদার্পণ। তাঁর আগে আবু তালিব। সেই যে ইউরোপ আবিষ্কার সেটা শুধু ভৌগোলিক অর্থে নয়। তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ছিল। সেটা কেবল স্পেসের দিক থেকে নয়। টাইমের দিক থেকেও। ইউরোপ যখন জাহাজে করে ভারতে এলো তখন এলো আধুনিক যুগ থেকে মধ্যযুগে। আর ভারত যখন জাহাজে চড়ে ইউরোপে গেল তখন গেল মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে। রামমোহন রায় দেশে থাকতেই আধুনিক যুগের বার্তা পেয়েছিলেন। বিদেশে গিয়ে আধুনিক যুগের স্বরূপ দেখলেন। পশ্চিমকেও দেখতে পেলেন তার স্বস্থানে। কলকাতার ইংরেজকে দেখে ইউরোপের ইউরোপীয়কে চেনা সম্পূর্ণ হয় না। রামমোহনের জীবনে এই সম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল।

একই কারণে মাইকেল মধুসূদনও যেতে ব্যাকুল হয়েছিলেন সেদেশে। এ ব্যাকুলতা ব্যাপকভাবে ছিল সেকালের শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরে। কিন্তু অতি অল্পক্ষেত্রেই তৃপ্ত হয়েছিল। যাঁরা ইউরোপে যেতে পারেননি তাঁরাও আধা বিলিতী শহর কলকাতায় বসে বিলেতের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। কিংবা বম্বেতে বসে। কিংবা মাদ্রাজে বসে। এগুলিও আধা বিলিতী শহর। বা সিকি বিলিতী শহর। এদের মধ্যে মাদ্রাজ যদিও জ্যেষ্ঠ তবু কলকাতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কলকাতা ছিল রাজধানী। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের। ইংরেজ আমলের আগে হাজার হাজার বছর কেটেছে, পৌরাণিক মতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগ ও কলিযুগের একাংশ। কিন্তু ভারতের রাজধানী এর আগে কখনো ভারতের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রের এত কাছে ছিল না। সমুদ্রের এক পারে লণ্ডন, আরেক পারে কলকাতা। মাঝখানে জাহাজ চলাচল। অবাধ যাতায়াত।

জাহাজ যখনি কলকাতায় ভিড়ত তখনি তার থেকে নামত আধুনিকতম বইপত্র, খবরের কাগজ, যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য, সাজপোশাক, মনিহারি, অসংখ্য কৌতূহলপ্রদ সামগ্রী বা কস্মিন্‌কালে ভারতে উৎপন্ন হয়নি বা হতো না। দেশ একটু একটু করে আধুনিক হয়ে উঠল। এবং কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য। যেমন গথিক ধরনের গির্জায় বা কলোনিয়াল শৈলীর বাসভবনে। কলকাতার ধনী ও অভিজাতদের জীবনধারা দুই খাতে প্রবাহিত হলো। একটি আধা হিন্দু আধা মোগলাই। অপরটি তৎকালীন অর্থে অ্যাংলোইণ্ডিয়ান। লাটবেলাটরা যে ধারার বাহক। মধ্যবিত্ত বলে আস্ত একটি শ্রেণীর উদ্‌ভব ঘটল। এঁরা হাফ শহুরে, হাফ গ্রাম্য। পরিবার পড়ে থাকে গ্রামে। এঁরা রোজগার করেন শহরে। মনটা মধ্যযুগে, চোখ দুটো আধুনিক যুগে। বুঝতে পারেন না ব্যাপারখানা কী। কারা সব এসেছে, কেন এসেছে, কী নিয়ে এসেছে, কী নিতে এসেছে। ওরা কি রাজা, না সওদাগর, না ধর্মপ্রচারক, না পণ্ডিত, না সৈনিক। সমুদ্রের ওপারেও দেশ আছে। সে দেশও মাটির? গায়ের রং অমন কেন? ওরা কী ভাবে?

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলো। ইংরেজীর মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হলো। নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ছাপাখানার সূচনা হয়েছিল। বাংলা হরফে ছেপে বই বেরোল, পত্রিকা বেরোল। যারা ইংরেজী ভালো জানে না তারা বাংলা পড়ে

জগতের সঙ্গে যুক্ত হলো। ভারতও সে জগতের অন্তর্গত। তার আগে ভারত সম্বন্ধেই বা কে কতটুকু জানত। এমন কি বাংলাদেশ সম্বন্ধেও জানবার উপায় ছিল না তেমন। ঐ লোক মুখে শোনা বা স্বচক্ষে দেখা। সংস্কৃত বা আরবী শিখে সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হতো না। ফারসী শিখে যা হতো তাও হাতে লেখা ফারসী কেতাব পড়ে। সেও কতকালের পুরোনো। আধুনিক জগৎ তখনকার দিনের সংস্কৃত আরবী ফারসী ভাষায় পরম বিদ্বানদেরও জ্ঞানগম্য ছিল না। অথচ একটি সাধারণ ইংরেজেরও ছিল। মানুষমাত্রেরই প্রাণে জ্ঞানের জন্যে আকুলতা আছে। গাছের প্রাণে যেমন আছে আলোর জন্যে আকুলতা। গাছকে যদি ঢেকে রাখা হয় তবে শুধু রস টেনে সে বাড়ে না। বেঁচে থাকতে পারে। এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো পায়নি বলে বাড়েনি। পণ্ডিতরাও মাথায় খাটো বহরে বড়। তাঁদের মনটা পৌরাণিক। তাঁরা যে কোন্ যুগে বাস করছেন তাই তাঁরা জানতেন না। শুধু জানতেন যে সেটা কলিযুগ। সুতরাং অবজ্ঞের। নেতৃত্ব অনায়াসেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে চলে গেল। এঁরাই হলেন সমাজের ভ্যানগার্ড।

কলকাতা ভারতের রাজধানী না হলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু বারো মাস ত্রিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা ভারতশাসনের কেন্দ্রস্থলে বাস করে শিক্ষিত মানুষ হলো ভারতমনস্ক। তার চেতনা যেমন একটা রেখা ধরে পূব থেকে পশ্চিমে যাতায়াত করতে থাকল তেমনি আর একটা রেখা ধরে ভারতবর্ষের বর্তমান থেকে সুদূর অতীতে। সে অতীত পুরাণ পারাবারের ওপারে উপনিষদ্ প্রান্তে অবস্থিত। যেমন সে পশ্চিম মহাসিন্ধুর ওপারে ব্রিটেন দ্বীপে আবর্তিত। মাঝখানে ইরান, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি কত না দেশ। শিক্ষিত মানুষের সে-সবে আগ্রহ নেই। মাঝখানে তেমনি কত না পুরাণ, কিংবদন্তী, মঙ্গালকাব্য। শিক্ষিত মানুষের তাতেও রুচি নেই। মাঝখানকার দেশকাল লঙ্ঘন করে তার চেতনা গিয়ে উপনীত হয় একদিকে উপনিষদ্ প্রান্তে, অপরদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনপ্রান্তে। রামমোহন রায় যেমন ইউরোপ পুনরাবিষ্কার করেন তেমনি উপনিষদ্ পুনরাবিষ্কার করেন। যেমন স্পেস অতিক্রম করেন তেমনি টাইম অতিক্রম করেন। সেই সময় থেকে শিক্ষিত মানুষমাত্রেই স্পেস টাইম সচেতন। দেশকাল সচেতন।

রামমোহন এর মধ্যে কোনো স্বতোবিরোধ দেখতে পাননি। নিজের জীবনে ও মনে তিনি একপ্রকার সামঞ্জস্য ঘটান। ভারতবর্ষের রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন উভয়েরই তিনি সূত্রপাত করে যান। বাংলাদেশে ও তার বাইরে সারা ভারতে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায়। সমাজসংস্কারের ধূম পড়ে যায়। ধর্মেরও নবযুগ আসে। সাক্ষাৎভাবে না হোক পরোক্ষভাবে এটা তাঁর সেই সামঞ্জস্যের ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোনো কথা ছিল না যে ইউরোপকে ও আধুনিককে বর্জন করতে হবে, কেবল ভারতের "সনাতন"কে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু শতাব্দী না ঘুরতেই বিরোধ দেখা দিল। অর্থনৈতিক বিরোধ থেকে রাজনৈতিক বিরোধ, রাজনৈতিক বিরোধ থেকে নৈতিক তথা

সাংস্কৃতিক বিরোধ। মনে হলো পশ্চিমের সূর্য যে আলো দিচ্ছে সেটা আলো নয়, আলেয়া। আটলান্টিকের পার থেকে যে হাওয়া আসছে সেটা বসন্তের হাওয়া নয়, বসন্তরোগের হাওয়া। পশ্চিমদিকের দোর জানালা বন্ধ না করলে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজ ধর্ম সুরুচি ও সুনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ভারতের আত্মা হারিয়ে যাবে।

সেই আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীটারই এক ভাগ এই সময় হয়ে ওঠে রিয়ারগার্ড। অপর ভাগটার হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায়। ভ্যানগার্ডের ভাগ্য নির্ভর করে ইংরেজের ঔদার্যের উপরে। সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শাসনের অংশ দেয়, শোষণ কমায়, তবেই জোর গলায় বলতে পারা যাবে যে ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রেসী, লিবারল মতবাদ, মানব প্রগতি ইত্যাদি কথার কথা নয়, কথা অনুসারে কাজও হচ্ছে, ইংলণ্ড এরই জন্যে ভারতে এসেছে ও ভারত এরই জন্যে ইউরোপে গেছে। ইউরোপ একটা নতুন যুগের প্রতীক। ভারতের যুগান্তর ও রূপান্তর তাকেই আশ্রয় করে হবে।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার নিজের ঘরেই সঙ্কট ছায়া ফেলেছিল। অপরিমিত জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত ধনবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত জনবৃদ্ধি হয়েছিল। জ্ঞান আর শক্তি আর ধন এক শিবিরে। জন অন্য শিবিরে ডিসরেলি বলেছিলেন ইংলণ্ড আসলে এক নেশন নয়, দুই নেশন। ধনীরা এক নেশন, দরিদ্ররা আরেক নেশন। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রত্যেকটি নেশন তলে তলে দুই নেশনে বিভক্ত হয়ে যায়। তেমনি এক নেশনের সঙ্গে অপর নেশনের শক্তিবৈষম্য ও ধনবৈষম্য বেড়ে যায়। শিল্পবিপ্লবের আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতায়। ইংলণ্ড এগিয়ে গেলে জার্মানী রাগ করে, জার্মানী এগিয়ে গেলে ফ্রান্স ভয় পায়। রাশিয়া এগোতে চাইলে জার্মানী প্রমাদ গণে। ঘরে শূদ্র অভদ্র হয়ে উঠছে, বাইরে প্রতিবেশী রুদ্র হয়ে উঠছে। মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেরও জল্পনা কল্পনা চলছে। শতাব্দীর পূর্বাহ্ন যেমন আশান্বিত করেছিল শতাব্দীর সায়াহ্ন তেমনি আশঙ্কিত করে।

সুতরাং ইউরোপ নিজেই নিজেকে নিয়ে বিব্রত। ইউরোপীয় মনীষীরাই ইউরোপের কঠোরতম সমালোচক। রেনেসাঁসের সময় থেকেই ইউরোপে যেমন একটা মানবিক ধারা ছিল তেমনি ছিল একটা ধার্মিক ধারা। ধার্মিকরা রেনেসাঁসকে অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেননি, কারণ বিজ্ঞান এসে তাদের চিরাচরিত জগৎজিজ্ঞাসা ও জীবদর্শন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন চিন্তাকে তাঁরা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। স্বাধীন বিশ্বাসের উপর তাঁরা খড়্গহস্ত। অপরপক্ষে মানবিকরা কোনো প্রকার ডগমা কিংবা অথরিটি মানবার পাত্র নন। তার চেয়ে আগুনে পুড়বেন। কারাগারে পচবেন। ইউরোপীয় সভ্যতা রেনেসাঁসের প্রসাদেই আধুনিক সভ্যতা হয়েছে। রেনেসাঁস উলটে দিলে তার আধুনিকতার স্রোত উজান বইবে। তাকে ফিরে যেতে হবে মধ্যযুগে। শিক্ষিত ইউরোপের যাঁরা ভ্যানগার্ড তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। অথচ ফরাসীবিপ্লব দেখে শিল্পবিপ্লব দেখে তাঁদেরি কতক হলেন ক্রমে রিয়ারগার্ড। ফিরে চল রেনেসাঁসের

পূর্বে। রাফেলের পূর্বে। ধনতন্ত্রের পূর্বে। ইউরোপ যখন ছিল সুন্দর। মানুষ যখন ছিল পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। ইউরোপের রেনেসাঁসের আদি পুরুষরাও মধ্যযুগকে লঙ্ঘন করে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর গ্রীকযুগে। খ্রীস্টানকে ডিঙিয়ে পেগান জীবনাদর্শে। গোড়ার দিকে তাঁরাও এর মধ্যে স্বতোবিরোধ লক্ষ করেননি। সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু রেনেসাঁসের কিছু কাল পরে যে রেফর্মেশন এলো আর তার প্রতিক্রিয়ায় যে কাউন্টার রেফর্মেশন দেখা দিল সেটা ধর্ম ও সমাজঘটিত হলেও জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যদৃষ্টি নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সংস্কারকরা ছিলেন প্রতিমাপূজার শত্রু। যীশুর জননী মেরীর মূর্তি তাঁরা সহ্য করবেন না। গির্জাকে মূর্তি দিয়ে তাঁরা সাজাবেন না অথচ মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করেই পরম সুন্দর হয়েছিল ইউরোপের মধ্যযুগের ভক্তিমার্গীয় আর্ট। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় কাউন্টার রেফর্মেশন নিছক প্রতিক্রিয়া নয়। পূর্ববর্তীরা যেমন প্রোটেস্টাণ্টরা তেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেননি। পরে যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন তাঁরা ধর্ম জিনিসটাকেই পরিহার করলেন। তাতে প্রোটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের উপর জয়ী হলেন না। জয়ী হলো সেকুলার মনোভাব।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভ্যানগার্ড থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়ে রিয়ারগার্ড রচনা করলেন তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর দোষারোপ তো করলেনই, ভ্যানগার্ডকেও অব্যাহতি দিলেন না। ধর্ম আর সমাজ নিয়ে গভীর মতবিরোধ। তেমনি জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যবোধ নিয়েও। সাকারবাদ থেকে যে সৌন্দর্য সারা ভারত জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নিরাকারবাদ থেকে তার তুলনায় কতটুকু হয়েছে? কেন আমাদের পিতৃপিতামহের মন্দিরে যাব না? কেন বঞ্চিত হব সৌন্দর্য থেকে? আমরা কি বাইরের লোক যে বাইরে থেকে দৃষ্টিপাত করেই তৃপ্ত হব! আরো গভীরে যেতে হবে। নইলে আর একটা কোণার্ক আর একটি নটরাজ গড়তে পারব না। তেমনি সংস্কৃত কাব্যে নিমগ্ন হতে হবে, নইলে আর একখানি রামায়ণ বা মহাভারত হবে না। বর্জন যদি করতে হয়। ইউরোপকে কর, রেনেসাঁসকে কর, রেফর্মেশনকে কর, কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্মকে নয়, বর্ণাশ্রমী সমাজকে নয়, মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাকে নয়, কারুশিল্পকে নয়। ইংরেজ আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, গ্রামসংগঠন ধ্বংস করেছে, সভ্যতার পায়ে কুড়ুল মেরেছে। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত ভ্যানগার্ড তাতে সায় নিয়ে এবং পশ্চিমের অনুকরণে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন ঘটিয়ে এমন কী অর্জন করছেন বা সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে ক্ষতিপূরণ হতে পারে! ইংরেজ তো মোয়া দিচ্ছে না। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হলেও তো আত্মশক্তি চাই, তার উদ্বোধন চাই। সে কি শুধু কথায় হবে? তার জন্যে চাই বিপরীত মার্গ গ্রহণ। এ মার্গ বর্জন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্য তথা আধুনিক সভ্যতাকে সহর্ষে গ্রহণ করার, সেই সঙ্গে ভারতের উপনিষদ্‌যুগের সভ্যতাকে সযত্নে ফিরিয়ে আনার। এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করে উভয় তটে অবাধে গমনাগমন করার। সে সময় নব্য শিক্ষিতরা সকলেই একমত। দ্বিমত দেখা গেল শতাব্দীর শেষভাগে। পাশ্চাত্য

তথা আধুনিককে গ্রহণ করতে দ্বিধাভাব এলো। অনেকের আত্মসম্মানে বাধল। একেবারে ইংরেজী বাদ দিতে না পারলেও ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শনের প্রতি বিমুখ হলেন তাঁরা। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এমন উত্তেজিত হলেন যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতের মতো পাঁতি দিলেন ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ে কাজ নেই, তার বদলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়। বিজ্ঞানশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হলো না বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা অনেকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলেন। যুক্তিবাদ পিছু হটল। সামনে এলো অবতারবাদ, গুরুবাদ, সাকারবাদ। "আনন্দমঠ।" সন্ন্যাসীনেতৃত্ব। ব্রাহ্ম হলেন ব্রাহ্মণ। প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

শতাব্দীসায়াহ্নের প্রেরণা অবাধ গ্রহণের ও মিশ্রণের নয়। প্রধানত বর্জনের। সামান্য মিশ্রণের। চরমপন্থীরা তাতেও নারাজ। তাঁদের ভারত হবে ইউরোপের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সঙ্গে আধুনিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারত। তাঁরা বর্জন করবেন ইউরোপকে তথা আধুনিককে। তাঁদের বর্জনশীলতা সেইখানেই থামবে না। উপনিষদেও তাঁদের কাজ নেই। গীতা, চণ্ডী, পুরাণ ও ব্রতকথা হলে তাঁরা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। মেয়েদের যদি পড়াশুনা করতেই হয় তবে মহাকালী পাঠশালায়। বাড়ীতে যারা থাকবে তারা শিখবে ব্রতকথার মাধ্যমে। ভারতের স্বধর্ম বলতে তাঁরা বুঝবেন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম। তার ঘাঁটি হচ্ছে গ্রামে ও মেয়েমহলে। এসব ঘাঁটিতে ইংরেজীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাংলা ঢুকতে পারে, কিন্তু সে বাংলা হবে পুরাতন সংস্কৃতির বাহন, আধুনিক সংস্কৃতির নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারবাহী নয়। স্বদেশ ও স্বধর্ম একাকার হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর মধ্যে বর্জনের ভাবটাই প্রবলতর ছিল, গ্রহণের ভাবটা অতি ক্ষীণ। এবং চরমপন্থীরা যেমন আধুনিক ইউরোপকে বর্জন করলেন তেমনি উপনিষদের ভারতকেও। তাঁদের আন্তরিক আনুগত্য পৌরাণিক বর্ণাশ্রমী ভারতের প্রতি। বেদ তাঁদের নমস্য, কিন্তু স্মৃতি তাঁদের নিয়ামক। দর্শনে তাঁরা অদ্বৈতবাদী, কিন্তু কার্যত কালীপূজক। এটাও যে একপ্রকার বর্জন তা কেউ ভেবে দেখলেন না। সংরক্ষণ মানে শিকায় তুলে রাখা নয়। জীবনে প্রয়োগ করতে করতে চালু রাখা।

সুবিধামতো ভুলে যাওয়া হলো যে মুসলমান বলে আর একটি সম্প্রদায় আছে। তারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য থাকতে পারে। মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো কেউ জন্মাননি, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনও হয় এক পুরুষ বিলম্বে। রেনেসাঁস বা রেফর্মেশন কোনোটাই ঠিকমতো স্টার্ট পায়নি সে সমাজে। পেতো আরো কিছুদিন পরে, যদি না হিন্দু সমাজ বিপরীত মার্গ ধরত। মুসলমান সমাজের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড দেখল বিপরীত মার্গ নিলে মোগল ভারতে উপনীত হওয়া দুরাশা। পৌঁছবে হয়তো হিন্দু ভারতে। সে ভারত মুসলমানের জন্যে নয়। তার চেয়ে ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলানো শ্রেয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বাঁধা বখরা মেলার আশা আছে। একেবারে বঞ্চিত হবার ভয় নেই। মুসলমান সমাজেও দ্বিমত ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড মোটামুটি

একমত। মোল্লা মৌলানাদের কথা আলাদা। তাঁদের চোখে সব কিছুই বর্জনীয়। যেমন আধুনিক ইউরোপ তেমনি উপনিষদের ভারত তেমনি পৌরাণিক ভারত তেমনি আধুনিক ভারত। তাঁদের গ্রহণযোগ্য শুধু শরিয়তী রাষ্ট্র। তাঁদের আনুগত্য ভারতের প্রতি নয়, ইসলামের প্রতি। ইংরেজের হাত থেকে ভারত ফিরে পেলে তাঁরা দ্বিতীয় আওরংজেবকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষেক করতেন।

আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইউরোপ আবিষ্কার তথা আধুনিক আবিষ্কার এই দুই আবিষ্কারের উল্লাসে মুখর। দেখতে দেখতে সাহিত্যে শিল্পে শিক্ষায় সমাজে ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এলো। মনে হলো না যে একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে যা আরো মূল্যবান। যার ক্ষতিপূরণ নেই। শতাব্দীর জমাখরচের হিসাবনিকাশের সময় যখন এলো তখন দেশের চিন্তাশীলদের মধ্যেই মতভেদ লক্ষিত হলো। যাঁদের মধ্যে যুগচেতনা প্রখরতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন সেতুবন্ধ দিয়ে গমনাগমনের ফলে যা লাভ করা গেল তাকেই। সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই। যাঁদের মধ্যে দেশচেতনা বা দেশাত্মবোধ প্রবলতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন যা হারিয়ে গেল বা ভেঙে গেল বা লুট হয়ে গেল তাকেই। সেই বিচ্ছিন্ন আত্মগত ঐতিহ্যবাহী জীবনধারাকে। মুসলমানরাও তাকে তেমন ছিন্নভিন্ন করেনি রেল স্টীমার কলকারখানা যেমন করেছে। এইসব কলকারখানা ইংলণ্ডে অবস্থিত ও এর লভ্যাংশ ইংরেজের ভোগে লাগে। ভারত শুধু কাঁচামাল যোগায় ও তৈরি মাল কিনতে বাধ্য হয়। তার চিরকালের কারুশিল্প বিনষ্ট হয়। দারিদ্র্য ব্যাপক ও গভীর হয়। বৃহত্তর স্বার্থ বিপন্ন হয়। মনের অন্ধকার দূর হলে হবে কী, বাহির অন্ধকার। যার অতীত এত গৌরবময় তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন।

যুগদর্শী চিন্তানায়করা স্বীকার করতেন না যে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পশ্চিমের সঙ্গে তার আদান প্রদান অনাবশ্যক। তাঁরা বরং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অভাবটাকেই বড় করে দেখতেন ও তার জন্যে পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধটাকে একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য করতেন। জ্ঞান বিজ্ঞান না হলে ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ হবে না, অপূর্ণ থেকে যাবে, বহু শতাব্দী পেছিয়ে থাকবে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান যে পশ্চিমের সাহায্য বিনা ভারতের ভিতর থেকেই আপনি উঠে আসবে এটা তাঁরা মেনে নিতে পারতেন না। ভারতকে একলা ছেড়ে দিলে সে যে ইউরোপের মতো জ্ঞানে বিজ্ঞানে আধুনিক হবে এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। পরের কাছে শিখতেই যখন হবে তখন সম্বন্ধ একটা পাতাতে হবেই। তবে সেটা যে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ হবে এমন কোনো কথা নেই। সেটা হবে সমানে সমানে সম্বন্ধ। তার লক্ষণ ইউরোপে দেখা যাচ্ছে। ভারতেও দেখা যাবে। ভারতও স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নয়।

অপরপক্ষে দেশভক্ত মনীষীরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী না করলে তার স্বধর্ম রক্ষা করা যাবে না। পরধর্ম তার পক্ষে ভয়াবহ হবে। জ্ঞান বিজ্ঞান পরের কাছ থেকে পাওয়া গৌরবের কথা নয়। পার্থিব ভোগবিলাস যে চায় না তার ওসব নিয়ে হবে কী? ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে ভারতেরই দ্বারস্থ হবে বিশ্ব। ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ

যদি হারিয়ে যায় তবে বিজ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্য তার কোন্ কাজে লাগবে? যা আছে তাকেই সমস্ত শক্তি দিয়ে সংরক্ষণ কর। যা নেই তার জন্যে উদ্বাহু হতে যেয়ো না। ভারতের যা আছে আর কারো তা নেই। দৃষ্টিকে দেশের উপর সন্নিবদ্ধ কর। দেশের বর্তমান থেকে যে রেখাটি ধরে দেশের অতীতে যাওয়া যায় সেই রেখাটি ধর। দেশ থেকে যে রেখাটা ধরে পশ্চিমে যাওয়া যায় সে রেখাটা ছাড়ো। আধুনিকতার মোহ কাটাও। আধুনিক তো চিরন্তন নয়। সেও পুরাতন হবে। দু'দিনের দম্ভ দু'দিন পরে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত।" আধুনিক ইউরোপেরও আদি অবসান আছে। সনাতন হচ্ছে ভারত। তার নেই আদি অবসান। পরাধীনতা দূর করাই আপাতত একমাত্র কর্তব্য। স্বাধীন ভারত বিচ্ছিন্ন হবে কি না এখন থেকে ভাবতে হবে না। বাইরে থেকে বড় জোর বিজ্ঞানকে নিতে পারে। আর সব তার আছে।

সব মানুষের অগ্রগতির যদি একটাই পন্থা থাকে তবে মানতে হবে যে ইউরোপ এগিয়ে রয়েছে, ভারত পেছিয়ে রয়েছে, সঙ্গ রাখতে হলে পিছু নিতে হবে, ধরে ফেলতে হবে, ছাড়িয়ে যেতে হবে। জাপান যা করতে চেষ্টা করেছে। স্বাধীন হয়ে থাকলে ভারতও বোধ হয় তাই করত। তা করলে কিন্তু স্বীকার করা হতো যে সব মানুষের জন্যে একই রাস্তা। সব মানুষের একটাই সভ্যতা। একটাই বিজ্ঞান। একটাই বিজ্ঞানদৃষ্ট রিয়ালিটি। একটাই ন্যায় অন্যায়বোধ। সাহিত্যে ও আর্টে একটাই বিশ্বজননী বাণী। এইখানে দেখা দিল মতবিরোধ। আবিষ্কারের ঘোর কেটে গেছে। ইউরোপকে বা আধুনিককে দেখে পরম বিস্ময় জাগছে না। প্রতিদিন তার বর্বরতার সংবাদ চোখে পড়ছে, তার স্বার্থপরতার আঁচ গায়ে লাগছে। যেসব কারণে গ্রীস রোম বিলীন হলো সেইসব কারণে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাও অধঃপাতে যাবে। তা হলে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া কেন? পথ এক নয়, পথ একাধিক। ভারতের পথ আধ্যাত্মিকতার। ভারত সে পথে এগিয়ে রয়েছে, ইউরোপ রয়েছে পেছিয়ে। পাল্লা দিতে হয় ভারতের পিছু পিছু ইউরোপই দেবে।

পথ এক নয়, পথ দুই। ক্রমেই এ ধারণা দৃঢ়মূল হতে থাকে। পরাধীনতার বেদনায় এ ধারণা জাত হলো বললে সবটা বলা হয় না। জাপান তো পরাধীন হয়নি। সেখানেও এর অনুরূপ দেখা গেল ওকাকুরার রচনায় ও কার্যকলাপে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্টের সংক্রমণ থেকে তিনি তাঁর দেশজ শিল্পাদর্শ সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজি এসে জাপানের সৌন্দর্য নাশ করছে দেখে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে তিনি বুদ্ধের দেশের শরণ নেন। সৌন্দর্যের ঐতিহ্যগত আদর্শে ভারত, চীন ও জাপান একপন্থী, কারণ সে আদর্শ প্রকৃতির অনুকৃতি নয়, চিত্তের গভীরতর স্তরে তার ভিত্তি। প্রাচ্যের সৌন্দর্য সাধনা অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওকাকুরার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠতা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। এই কবি যে একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেন তা কবিও জানতেন না, ওকাকুরাও না। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি কর্ণগোচর হবার অল্পদিন পরে ওকাকুরার

দেহান্ত হয়। তাঁর দেশ তাঁর কথা শুনল না। ইউরোপের পথের পথিক হলো। সংসারের বিনিময়ে আত্মাকে হারালো। তাই তিনি ভগ্নহৃদয়ে অকালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মতোই জাপানকে সাবধান করে দেন। ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে অপ্রিয় হন। ন্যাশনালিজম জাপানের বা ভারতের স্বধর্ম নয়। তবু উভয় দেশেই প্রবল। তাই এদেশেও তিনি অপ্রিয় হন।

এর মধ্যে একটু ভুল বোঝা ছিল। আধুনিক যুগে পড়বার আগে ইটালীও জাপানের ও ভারতের মতো আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাস করত। সাধারণভাবে ইউরোপও তাই। রেনেসাঁস না ঘটলে, পরে শিল্পবিপ্লব না ঘটলে সে বিশ্বাস এখনো তেমনি থাকত। প্রভেদটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানসাধনার। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়। স্বধর্ম ও পরধর্ম এরূপ ক্ষেত্রে কেমন করে দেশানুসারী হবে?

শুধু ভারতে নয় বা জাপানে নয় সব দেশেই দুটো বোঝাপড়া একসঙ্গে চলেছিল। একটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। আর একটা স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের। দৈনন্দিন জীবনে একটার থেকে আরেকটা পৃথক করা শক্ত। রেলগাড়ী বিদেশ থেকে আমদানী, তার থেকে লোকে ধরে নিল ওটা বিদেশী বা পশ্চিমী। আসলে ওটা একেলে। দেড়শ' বছর আগে কোনো দেশেই ওর অস্তিত্ব ছিল না। বিলেতেও বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি প্রথমে বিরাগ জাগিয়েছে। লোকে যন্ত্র ভেঙে দিয়েছে। রেনেসাঁসের একাধিক কারণের একটা হলো মুদ্রাযন্ত্র। সেটার উপরেও বহু লোক ক্ষিপ্ত হয়েছে। মনে করেছে ওটা নিছক মন্দ। "ভালো" "মন্দ" এই দুটি কথা নৈতিক বিচার থেকে ঐতিহাসিক বিচারে সম্প্রসারিত হলেও কোনো আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন বা অভিনবত্বই তার নাগাল এড়ায় না। আস্ত একটা যুগকেই "মন্দ" বলে সন্দেহ হয় ও সন্দেহ হলেই বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। আদিকালের ইতিহাস আমরা জানিনে। জানলে হয়তো এটাও জানা যেতো যে সেকালের লোক গোরুর গাড়ীকেও "মন্দ" বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল।

"ভালো" আর "মন্দ", "শাদা" আর "কালো", "স্বধর্ম" আর "পরধর্ম", "আধ্যাত্মিক" আর "জড়বাদী" এসব গণনা ইতিহাস ভূগোলের উপর বা দেশকালের উপর চাপালে তার পরিণাম হয় যা গ্রহণযোগ্য তার বহিষ্কার বা বর্জন। এবং যা পরিবর্তনযোগ্য বা পরিত্যাজ্য তার সংরক্ষণ। যেসব দেশ অতি পুরাতন বা দীর্ঘকাল হতে বিচ্ছিন্ন সেসব দেশে বহিরাগত ও নূতনের প্রতি একটা মারমুখো ভাব মজ্জাগত। সেদেশের মানুষ সিদ্ধান্ত করে বসে আছে যে ঘরে যা আছে তাই ভালো, আর বাইরে থেকে যা আসে তাই মন্দ। আগে থেকে যা আছে তাই স্বধর্ম, পরে যা এলো তাই পরধর্ম। এখানে যুগের পিণ্ডি চাপানো হয় বিদেশের উপরে। অতীত সম্বন্ধে মানুষের একটা মোহ আছে। তার সবটাই সুন্দর। যেটা যত প্রাচীন সেটা তত সুন্দর। সে কখনও মন্দ হতে পারে না, অপূর্ণ হতে পারে না। তাকে পরিবর্তন করতে হাত ওঠে না। মানুষের এই আসক্তি প্রকৃতির মধ্যে নেই। সে নির্মম হস্তে ভালো মন্দ সব ভেঙে ফেলে।

সব আবার গড়ে তোলে। তার স্বধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তা নিত্য ভাঙা নিত্য গড়া। নিত্য মাজা নিত্য ঘষা। নিত্য ধরা নিত্য ছাড়া। তার মধ্যে একটা কন্‌টিনিউইটি আছে। কিন্তু সেটা তার নিজের প্রবহমানতা। সেটুকু বাদ দিলে আর সব জিনিসের বেলা ডিস্‌কন্‌টিনিউইটি। পূর্ণচ্ছেদ। কত সভ্যতা গেল আর এলো। এলো আর গেল। আধ্যাত্মিক হলেও কি রক্ষা আছে, যদি না নিত্য ভাঙে নিত্য গড়ে? নিত্য মাজে নিত্য ঘষে? নিত্য ধরে নিত্য ছাড়ে? নিত্য ভাবে নিত্য বিচার করে? নিত্য শোধরায় নিত্য বদলায়? অনুসন্ধান করলে আনা যাবে ভারতও তাই করে এতকাল বেঁচে আছে। কিন্তু কোনো অবস্থায় আত্মাকে হারানো চলবে না। আত্মানাং সততং রক্ষেৎ।

ঊনবিংশ শতকের স্বর্ণলঙ্কায় বাস করেও রাস্‌কিন, এডওয়ার্ড, কার্পেন্টার প্রভৃতি অনেক মনীষীর মনেই সন্দেহ জেগেছে ইংলণ্ড ঠিক পথে চলেছে না ভুল পথে। তেমনি বিশাল ও বলবান রুশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও আভিজাত্য ভোগ করেও টলস্টয়ের সন্দেহ জেগেছে ততঃ কিম্‌। এঁরা এক একজন এক একটা নির্ণয়ে উপনীত হয়ে এক একটা পথ নির্দেশ করেছেন। এমনি একটা পথ নির্দেশ করেন কার্ল মার্কস। সে পথ তাঁর নিজের দেশ নেয় না। নেয় তাঁর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য এক দেশ। রাশিয়া। এতদিনে আরো অনেক দেশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে আছে চীন। সেই যার ঐতিহ্যের ভিত্তি ছিল নৈতিক। দেখা যাচ্ছে নৈতিক বা জড়বাদী, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, ভালো বা মন্দ কোনো বিশেষণই এক্ষেত্রে খাটে না। ঐতিহাসিক ভবিতব্য বলে একটা তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ মানুষের মন অধিকার করেছে। স্বয়ং ইতিহাস নাকি একটা পথ নির্দেশ করেছে। সে পথ নাকি একটাই পথ। সব দেশের সব মানুষের জন্যে। কেউ যদি তা না মানে তবে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে। সেটাও নাকি ইতিহাসের নির্দেশ। ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে নেই। আছে নীতিশাস্ত্রে। নীতিসম্মত পথ নির্দেশ করেছেন গান্ধী। সেই পথটাও শুধু একটি দেশের জন্যে নয়, সব দেশের জন্যে। কিন্তু কেউ যদি তা না মানে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে না। দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। মহৎ দৃষ্টান্ত।

উপরে যে পথগুলোর ইঙ্গিত দেওয়া হলো সেগুলো এক একটি দেশে নিবদ্ধ নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং জাপানের শুধু একটিমাত্র পথ বা ভারতের কেবল একটিমাত্র পন্থা এ ধরনের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায়ই শোনা যেতো। প্রায়ই অপর কোনো দেশের উপর নজর রেখে। দুটো দেশ যেন দুটো বিপরীত মেরু। আকাশ আর পাতাল যেমন বিপরীত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলে যায়। দেশ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু "ভালো" আর "মন্দ" বাঁটোয়ারা হয়নি। "শাদা" আর "কালো" গায়ের চামড়ায় থাকতে পারে, মনের বা চরিত্রের গঠনে নেই। "স্বধর্ম" আর "পরধর্ম" ব্যক্তির জীবনে সত্য হতে পারে, জাতির জীবনে অযথা। "আধ্যাত্মিক" ও "জড়বাদী" এমন কোনো দেশেরই গায়ে বসে না।

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রামমোহন প্রবর্তিত নতুন ঐতিহ্যে মানুষ। যুগপৎ যুগসচেতন তথা দেশসচেতন। এর মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা অনুভব করেননি। অকুণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ হস্তে দেশের কাছ থেকে বাম হস্তে যুগের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। বর্জনের কথা উঠলে দেশের দেবদেবী ও সাকার আরাধনা ত্যাগ করেছেন। পক্ষান্তরে সাহেবিয়ানা পরিহার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ ওঠে। সেটাও একটা বাইরের ঢেউ। নেপোলিয়নের পায়ের তলায় জাতীয়তার ঢেউ ওঠে যে দেশেই তিনি যান। ইটালীতে জার্মানীতে রাশিয়ায়। তেমনি ওঠে ব্রিটানিয়ার পদতলে। গর্বিত গৌরবময় দেশ ইটালী জার্মানী রাশিয়া। পরাজয়ের বা পরাধীনতার উত্তর দিল জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়ে। ভেবে দেখল না যে সেটাও হলো নেপোলিয়নেরই নৈতিক জয়। তেমনি ভারতবর্ষেও দেখা দেয় জাতীয়তাবাদ। ব্রিটিশ শাসনের উত্তরে গর্বিত গৌরবময় দেশের পৌরুষের অঙ্গীকার। ইংরেজী শিক্ষাই ছিল তার মূলে। যদিও তার মন্ত্র লেখা হলো সংস্কৃতে তথা বাংলায়।

বিরোধ পরিহার করা গেল না। গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল চাইলেই মিলবে স্বাধিকার। এমন ইংরেজও ছিলেন যাঁরা ভারতের পক্ষে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের হাতে কামধেনু পড়েছে। বশিষ্ঠকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দেবেন, তা কি হয়! দেশের মনোভাব দিন দিন বিরূপ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অবিচলিত থাকতে পারেন না। একটু একটু করে দেশচেতনায় আচ্ছন্ন হন। দেশের অতীতের অভিমুখে যে রেখাটি গেছে সেই রেখা ধরে চলেন। পশ্চিমের অভিমুখী রেখাটি—আধুনিকের অভিমুখী রেখাটি—একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও গৌণ হয়ে যায়। অতীত বলতে দেশের লোক বোঝে পৌরাণিক অতীত। ছবি আঁকতে বসলে পুরাণ থেকেই শিল্পীরা সৃষ্টির প্রেরণা পায় বেশী। তা ছাড়া অত বড় একটা মধ্যযুগকে ডিঙিয়ে যাবেই বা কী করে? বেদ উপনিষদ্ যতখানি সুদূর রামায়ণ মহাভারত ততখানি নয়। রামায়ণ মহাভারত যতটা সুদূর, ভাগবত বা চণ্ডী ততটা নয়। মানুষ দেশকেও "দশপ্রহরণধারিণী" দেবীমূর্তি বলে বন্দনা করতে ভালোবাসে। সে যে মাতৃমূর্তি। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে হিন্দুসমাজ থেকে যাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন তাঁদেরি একজনকে দেখা গেল বঙ্গামাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। স্বদেশী আন্দোলন সাকারবাদী আন্দোলন হয়ে উঠল! মধ্যযুগ ফিরে এলো। আধুনিক যুগ হলো রাজনীতিনিবদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্র যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের উপায় পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির উদ্বোধন।

স্বদেশী যুগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হয়েছিলেন। স্বাদেশিক শিক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশ পৌরাণিক সাকারবাদী স্বদেশ নয়। তাঁর কাছে ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন নয়। ধর্ম তাঁর কাছে সব কিছুর ঊর্ধ্বে। জাতীয়তাবাদের খাতিরেও তিনি অধর্ম করবেন না। দেশের স্বাধীনতার জন্যেও খুন ডাকাতী সমর্থন করবেন না। অন্ধ কুসংস্কারকে মুক্তি আন্দোলনের মিত্র করতেও তাঁর আপত্তি। মিত্রই কপট শত্রু। অন্ধতা থেকেই পরাধীনতা এসেছে। অন্ধতার মধ্যে প্রবেশ

করলে স্বাধীনতা আসবে কোন্ মায়াবলে! রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর প্রোগ্রাম গঠনকর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতার বুনিয়াদ মজবুৎ করা। আবেদন আর নিবেদন নয়, বয়কট আর বোমা নয়, নিরলস সংগঠন ও সেবা। সেই উপায়ে দেশকে আপনার করে নেওয়াই দেশজয়। অবশেষে অপসরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে মনে করল পুলিশের ভয়ে শান্তিনিকেতনে গা ঢাকা দিলেন। ধীরে ধীরে যুগচেতনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিলেন। সে যুগ স্বদেশী যুগ নয়, আধুনিক যুগ। তার সঙ্গে আড়ি করে পূর্ণভাবে বাঁচা যায় না। ইংরেজের সঙ্গে আড়ি করেও অগ্রসর হওয়া যায় না। "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।"

স্বদেশী যুগের অবসানে রবীন্দ্রনাথের মন যখন তৈরি হলো তখন তিনি হলেন আবার পশ্চিম অভিমুখে যাত্রী। বাইশ বছর বাদে। এবার ইউরোপকে—সেই সূত্রে বিশ্বকে—তাঁর কিছু দেবার ছিল। সে দেওয়া তাঁর দেশের হয়ে। তাতে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগেরও অন্তঃসার। উপনিষদের তথা বাউল বৈষ্ণব কবিরপন্থের বাণী। পুরাণের নয়। এই বাইশ বছরে তাঁর নিজেরও উপলব্ধি জমেছিল। একজন আধুনিক কবি সাধকের। কিন্তু তিনি শুধু দিতে যাননি। নিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। জাতীয়তার অভিমান তাঁকে উদাসীন বা অসহিষ্ণু করেনি। দিতে হলে নিতে হয়। নিতে বা পারলে দিতে পারা যায় না। আদান প্রদানেই তাঁর বিশ্বাস। "দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে।" এই তাঁর আদর্শ। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হলো মেলা আর মেলানো। পরাধীনতা বা সাম্রাজ্যবাদ একে উলটে দিতে পারে না। তিনি কিপলিং নন যে বলবেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। দুই কখনো মিলবে না।" তবে কিপলিং তার সঙ্গে এটুকুও জুড়ে দিয়েছিলেন যে, "পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও যদি আসে তবু তারা মিলবে যখন দুই বলবান পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়াবে।"

শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁর "যাত্রার পূর্বপত্র" রচনা করেন। তাতে বলেন, "য়ুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া আমরা যদি সেখানে যাত্রা করি তবে ভারবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?"

"য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাঁহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে। বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না? বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব নয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন

দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।"

এই রচনারই এক জায়গায় আছে, "আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে। এ কথা শুনিলেই দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির—য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরেই কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্য সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না—যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে। আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহেই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।"

দেশে দেশে অমিল যেমন আছে মিলও তেমনি আছে। প্রথম পরিচয়ে অমিলটাই বেশী করে নজরে পড়ে, কিন্তু নিকট পরিচয়ে মিলটা আরো বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আর দেশে দেশে অমিলের কথা অত বেশী শোনা যায় না, যত বেশী শোনা যায় মতবাদে মতবাদে অমিলের কথা। আমেরিকাতেও কমিউনিস্ট আছে, রাসিয়াতেও ডেমোক্রাট আছে। যে যার সুযোগের অপেক্ষায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ন্যাশনালিজম এখন আর উৎকট আত্মস্বার্থবাদ নয়। এক দেশ অপর দেশকে অনেক সময় বিনা শর্তে সাহায্য করছে। যেহেতু সে অবিকশিত। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছতে অনেক দিন লেগে গেল, অনেক সংঘাতের ভিতর দিয়ে আসতে হলো। সংঘাত ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বেলা নেশনে নেশনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলা কতকটা নেশনে নেশনে, কতকটা মতবাদে মতবাদে। এক দিক থেকে ওটা জার্মানীর সঙ্গে তার উভয় পার্শ্বের প্রতিবেশীদের রণ। আরেক দিক থেকে ওটা নাৎসী ফাসিস্ট মতবাদের সঙ্গে তার

বিরুদ্ধমতবাদী কমিউনিস্ট তথা ডেমোক্রাটদের ত্রৈরথ। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যেই তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। মতবাদগুলোরও আর সে ধার নেই। এখন আর সেগুলোকে থীসিস অ্যান্টিথীসিসের মতে লাগে না। মনে হয় একটা আরেকটার বিপরীত নয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই ঘোড়া যেমন বাজী রেখে দৌড়য়। একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে গিয়েই হারিয়ে দেখে, গুঁড়িয়ে দিয়ে নয়। সেইজন্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যত গর্জাচ্ছে তত বর্ষাচ্ছে না। পারমাণবিক বোমার ভয়ে নিবৃত্ত রয়েছে এটা অর্ধসত্য। নিবৃত্তি আসছে ভিতর থেকে। গণতন্ত্রী দেশুগলিতেও পাবলিক সেকটর হয়েছে এবং বাড়তে লেগেছে। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে যে পিছুটান দেখা দিয়েছিল সেটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর মন্থর হয়। কেবল ধর্মমিশ্রিত রাজনীতিতেই একটা স্বপথে ফিরে চলার ধ্যান ছিল। চরকা খাদিকে যদি অর্থনীতি বলা হয় তবে অর্থনীতিক্ষেত্রেও। কিন্তু দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে স্থাপত্যে স্বদেশের চেয়ে স্বকালের দিকে টান বাড়ে। কখনো প্রকাশ্যভাবে, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে। ক্লাসিকাল সঙ্গীতে ও নৃত্যেও আধুনিক রুচি ও রং লাগে। আধুনিক না বলে পাশ্চাত্য বললেও ভুল হয় না। পশ্চিমের উপর বিরাগটা রাজনীতিনিপুণদের মধ্যেই প্রকট। সাধারণ লোক তো বিদেশী ফিল্ম বলতে অজ্ঞান। তেমনি বিলিতী খেলা দেখতে পাগল। বিরোধটা একদা মনে হয়েছিল সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার। পরে মনে হলো নেশনের সঙ্গে নেশনের। পরিশেষে বোঝা গেল পলিসির সঙ্গে পলিসির। ওরা যুদ্ধ চায়। আমরা যুদ্ধ চাইনে, যদি না সিদ্ধান্তটা নিজের দায়িত্বে নিতে দেওয়া হয়। এতদিনে সেটা স্বীকৃত হয়েছে। এরই নাম স্বরাজের অন্তঃসার।

কিন্তু মানুষের জীবন থেকে ধর্মের অন্তঃসার বা নীতির অন্তঃসার যদি উবে যায় তা হলে অন্ধ জাতীয়তাবাদের মতো অন্ধ প্রগতিবাদও মানুষের দুর্গতির হেতু হবে। সে প্রগতি অধোগতি। তার থেকে উদ্ধার জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে হবে না। হবে কয়েকটি চিরন্তন সূত্রে বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ফলে। সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায় অনাধুনিক হয়ে যায়নি। প্রগতির সঙ্গেও এদের অনাত্মীয়তা নেই। রেনেসাঁস শুধু এই কথাই বলার অধিকার দাবী করেছে যে প্রকৃতির তথা মানুষের জীবনধারা বহু বিচিত্র ও বড় জটিল। বাবাজীরা তাকে যেমন দোরঙা ও সরল ঠাওরান তেমন সে নয়। রেনেসাঁস সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায়কে মধ্যযুগীয় বলে খারিজ করেনি। আধুনিক সভ্যতা যদি নীতির ও ধর্মের শাঁসকেও খোসার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয় তা হলে তারও শাঁস বলতে বিশেষ কিছু থাকবে না। গণতন্ত্র বা শ্রেণীসাম্য অতি মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু এহো বাহ্য। আগে কহো আর। বিশ্বজনীন চিরন্তন স্থিতিকেন্দ্র আছে, গতিই সব নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে "সভ্যতার সঙ্কট" লিখেছিলেন। "পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্কট" লেখেননি। কারণ পূর্ব পশ্চিমের দ্বৈত ততদিনে তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এককালে যেমন আমাদের রেলস্টেশনগুলোতে হিন্দু জল ও মুসলমান জল

ছিল, এখন নেই, তেমনি এক কালে কবিগুরুর মনেও পূর্ব পশ্চিমের ভেদবুদ্ধি ছিল, শেষে থাকে না। এর সূচনা খোঁজ করলে পাওয়া যাবে "গোরা"তেই। তাতে যে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার জাত নেই, 'বিচার' নেই, ঘৃণা নেই। সে শুধু কল্যাণের প্রতিমা। সে ভেদবুদ্ধিকে প্রেম দিয়ে অতিক্রম করেছে। যেমন আনন্দময়ী রূপে তেমনি সুচরিতা রূপে। আরো পরে আরো পরিণত হয় তাঁর অভেদবুদ্ধি।

"I have no hesitation in saying that those who are gifted with the moral power of love and vision of spiritual unity, who have the least feeling of enmity against aliens, and the sympathetic insight to place themselves in the position of others, will be the fittest to take their permanent place in the age that is lying before us, and those who are constantly developing their instinct of fight and intolerance of aliens will be eliminated. For this is the problem before us, and we have no prove our humanity by solving it through the help of our higher nature. The gigantic organizations for hurting others and warding off their blows, for making money by dragging others back, will not help us. On the contrary, by their crushing weight, their enormous cost and their deadening effect upon living humanity, they will seriously impede our freedom in the larger life of a higher civilization." (*Nationalism in India,* lecture delivered in America in 1916, published in the book *Nationalism.*)

"ঘরে বাইরে"র সমসাময়িক যে ইংরাজী বক্তৃতার থেকে উদ্ধার করা হলো তার শেষাংশের "উচ্চতর সভ্যতা" ভারতীয় বা পাশ্চাত্য নয়, মানবিক। "আমরা" সেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষ। বক্তা ভারতীয়, শ্রোতা মার্কিন। আর যেসব মূল নীতির উল্লেখ করা হলো সেগুলি যে কোনো ধর্মশাস্ত্রের বা নীতিশাস্ত্রের নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের উদ্দেশেও বলেছেন, ১৯১৬ সালে যা বলেছেন তা আজকের উদ্দেশেও বলা। আজকের রাশিয়াকে আমেরিকাকে ইংলণ্ডকে ফ্রান্সকেও বলা। বেঁচে থাকলে কবিগুরু আবার সেইসব কথা স্মরণ করিতে দিতেন।

বর্জন তাকেই করতে হবে বা মূলনীতিবিরুদ্ধ, যা অমানবিক, যা হৃদয়হীন ও অসাড় করে, যা বৃহত্তর জীবনের মুক্তি ব্যাহত করে। তা পাশ্চাত্য বলে নয়, আধুনিক বলে নয়। পাশ্চাত্য বলেই বা আধুনিক বলেই কোনো জিনিস বর্জন করার কথা ওঠে না। তেমনি কিছু গ্রহণ করব কি না সেটা নির্ভর করে তার গ্রহণযোগ্যতার উপরে। তার প্রাচীনত্বের উপরেও নয়। তার ভারতীয়ত্বের উপরেও নয়। তবে ভারত তার আত্মাকে হারাবে না, আত্মাকে দুর্বল হতে দেবে না, আত্মস্থ হবে।

পরাধীনতা থাকলেই তার গ্লানি থাকে। তার দরুন জ্বালা থাকে। পরাধীনতা মন্দ।

মন্দের অন্ত চাই। তার জন্যে সংগ্রাম করাই জগতের নিয়ম। কিন্তু পৃথিবীতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভালোও থাকে। এমন কিছুও থাকে যা ভালোমন্দের দ্বারা বিশেষিত বা নিঃশেষিত নয়। সেইজন্যে মন্দকে অগ্রাহ্য করতে গিয়ে সমগ্র রিয়ালিটিকে অস্বীকার করতে নেই। ভারত পরাধীন হলো, পতিত হলো, নিরস্ত্র হলো, ভগ্নমনোবল হলো, চারিত্র্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু এই সব নয়। ভারত একরাষ্ট্র হলো, বহির্জগৎ হতে অবিচ্ছিন্ন হলো, আধুনিক যুগে পদার্পণ করল, আলোকিত হলো, অগ্রসর হলো, বিকশিত হলো, নবজাত হলো, পুনঃসংস্কৃত হলো। ভারতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, সে চ্যালেঞ্জের উত্তরে ভারত তার আত্মাকে না হারিয়ে নির্মোকমুক্ত হলো, নবকলেবর ধারণ করল। পরাজয়সত্ত্বেও সে অপরাজিত।

এত কিছু কি সম্ভব হতো যদি ইংরেজ শুধু শত্রুতা করত? রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাকে শত্রুজ্ঞান করেননি, যদিও তার দুষ্কৃতির সমর্থনও করেননি। তার কাছে আবেদন-নিবেদনও করেননি। তাঁর দৃষ্টি ইংরেজকে ছাড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের উপর পড়েছিল। রোমান্টিসিজম ও লিবারল মতবাদের উপর পড়েছিল। তিনিও সেই মুক্ত স্রোতের মীন ছিলেন। বাংলার বদ্ধজলার মাছ হলে স্বাধীনভাবে বাড়তে ও সাঁতার কাটতে পারতেন না। ভারত সরোবরের মৎস্য হলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হতো, বৃদ্ধি ব্যাহত হতো। এখন যে বহু শতাব্দীর পরে স্রোত ফিরে এসেছে এটা বহির্বিশ্বের সঙ্গে খাল কেটে সংযোগ ঘটানোর ফলে। স্বাধীনতা তাকে উদ্দাম করেছে।

(১৯৬১)